মানবতা যখন আক্রান্ত, নিরবতা তখন অন্যায়!

নারী নির্যাতন-ধর্ষণ: কেন বাড়ছে? প্রতিকারের পথ কী?

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র | সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

নারী নির্যাতন–ধর্ষণ: কেন বাড়ছে? প্রতিকারের পথ কী?

দিনকয়েক আগের ঘটনা। সিলেটে স্বামীর সাথে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন এক তরুণী। এমসি কলেজের সামনে গাড়িতে বসে গল্প করার সময় ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীরা তাদের ঘিরে ধরে। স্বামীকে আটকে রেখে ওই তরুণীকে কলেজের ছাত্রাবাসে নিয়ে গণধর্ষণ করে। এরও কয়েকদিন আগে খাগড়াছড়িতে এক আদিবাসী বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী তরুণীকে বাঙালি সেটেলাররা গণধর্ষণ করে। ঢাকার সাভারে নীলা রায় নামে এক নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল এক বখাটে যুবক। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় রিকশা থেকে টেনে নামিয়ে দিনে দুপুরে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কুষ্টিয়ার মিরপুরে এক মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণ করে মাদ্রাসা সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চতুর্থ শ্রেণীর এক মাদ্রাসা ছাত্রকে ধর্ষণ করে এক মাদ্রাসা শিক্ষক। প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এরকম শত শত ধর্ষণ–গণধর্ষণ ও নারী–শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। দেশ যেন ধর্ষকদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। পত্রিকায় ঘটনাগুলো সামনে আসার পর দেশের বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে আলোড়ন তুলেছে। কোথাও কোথাও হয়েছে প্রতিবাদ।

এর মধ্যেই ৪ অক্টোবর নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে যুবলীগের দেলোয়ার বাহিনী কর্তৃক এক নারীকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ভিডিও চিত্র ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। ঘটনা আরও এক মাস পূর্বের। কিন্তু এর মধ্যে পুলিশ তার হদিস পায়নি। গ্রামবাসীরা নির্যাতকদের ক্ষমতার দাপটের কারণে প্রতিবাদ করেননি। ভিক্টিমও ভয়ে মুখ খোলেননি। অভাবিত এই ঘটনায় দেশের মানুষ স্তম্ভিত–হতবাক! লাঞ্ছিত অপমানিত এক নারীর আর্তনাদ – 'বাবা গো, তো গো আল্লার দোহাই লাগি, ছাড়ি দে'। বাবা ডেকে, আল্লার দোহাই দিয়েও নির্যাতকদের মন গলাতে পারেননি ওই নারী। কিন্তু এই আর্তনাদের ধ্বনি মানুষের কানে কানে পৌঁছে গিয়েছে। তাই সারাদেশে ঝড় উঠেছে প্রতিবাদের। ছাত্র–নারীসহ সমাজের সর্বস্তরের বিবেকবান মানুষেরর হৃদয় কেঁপে উঠেছে–এই সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষকে ধীরে ধীরে কোন অতলে নিয়ে যাচ্ছে দেশের শাসকরা? ঘরে–বাইরে–কর্মক্ষেত্রে–শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনকি ধর্মীয় উপাসনালয়ে–কোথাও নারীর নিরাপত্তা নেই, মর্যাদা নেই। ধর্ষণ–নির্যাতনের কতটুকু খবর আর আসে পত্রিকায়? দু'একটি ঘটনায় হয়তো আলোড়ন উঠে–আবার হারিয়ে যায়। বরং দিন দিন ঘটনার ব্যাপকতা, মাত্রা, বীভৎসতা যেন আরও বাড়ছে। এক একটি নির্যাতনের বীভৎসতা, নৃশংসতা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আরেকটিকে।

গোটা দেশের সচেতন মানুষ ধর্ষণ–নির্যাতনের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে সরব। অনেকেই রাস্তায় নামছেন। এ সময়ই একটা প্রশ্নের বোঝাপড়া খুব জরুরী। আমাদের দেশে ধর্ষণ বেড়ে যাওয়ার কারণ কী? নারীর উপর ধর্ষণসহ নিপীড়ণ–নৃশংসতা বাড়ছে কেন? এর শেষ কোথায়?

আমরা এই বিষয়টির একটু গভীরে দৃষ্টি ফেলতে চাই। নারীদের প্রতি সামাজিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞান ও ইতিহাসসম্মতভাবে কী হওয়া উচিত আর কেমন আছে, কেন একটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠলনা–এই বিষয়গুলোর খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ দরকার। তা না হলে আন্দোলনও সঠিক দিশা পাবে না। এক একটি ঘটনা প্রচণ্ড ভয়াবহতা নিয়ে সামনে আসলে মানুষ রাস্তায় নামবে, প্রতিবাদ করবে। কিছুদিন পর সব থিতিয়ে যাবে, ফিরে আসবে আগের গতানুতিক জীবন। চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হউক, এ আন্দোলন বিজয়ের পথে এক কদম এগিয়ে দিয়ে গেল– এটা তখনই আমরা বলতে পারব যখন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আন্দোলনে যুক্ত মানুষদের কাছে ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকবে। তখনই বিরাট সংখ্যক যুক্ত মানুষের মধ্যে অল্প সংখ্যক সচেতন ও শিক্ষিত মানুষ তৈরি হবে যারা এই আন্দোলনের সামাজিক সাংস্কৃতিক কারণকে ধরতে

পারবে এবং এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইকে সত্যিকারের দিক নির্দেশনা দিতে পারবে।

বিচারহীনতার কারণে বাড়ছে ধর্ষণ-নির্যাতন

আলোচনায় এই বিষয়টি সবার আগে আসবে। কারণ অন্যায় প্রশ্রয় পেলে, এর বিচার না হলে অন্যায়কারীরা উদ্ধত হয়, বেপরোয়া হয়। অপরদিকে সাধারণ মানুষ, যারা অন্যায়ের শিকার হন; তাদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ে, ক্ষোভ বাড়ে, সেটা প্রতিবাদের রূপ না পেলে সমাজে নেমে আসে হতাশা এবং মেনে নেয়ার সংস্কৃতি। অন্যায়ই তখন নিয়ম হয়, বিচার ও শাস্তি হয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

আমাদের দেশেও তাই ঘটেছে। চলতি বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯৪৮টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৪১ জন নারীকে। ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছে ৯ জন। আর ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়েছেন ১৯২ জন। ২০১৮ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন ৭৩২ জন। আর ২০১৯ সালে ধর্ষিত হয়েছেন ১৪১৩ জন। অর্থাৎ বছরের প্রথম নয় মাসেই ধর্ষণের সংখ্যা ২০১৮ সালকে ছাড়িয়ে গেছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে ধর্ষণের সংখ্যা আরও বেশি। কারণ সব ঘটনা প্রকাশ্যে আসে না বা থানা পর্যন্ত যায় না। বাংলাদেশের আইনে ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনকে একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। যেকোনো অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে আইনের প্রয়োগ জরুরি। কিন্তু দেশের আইনে ধর্ষণ ফৌজদারি অপরাধ হলেও এটি প্রায় অকার্যকর। এর প্রয়োগ বা বিচার নেই বললেই চলে।

২০১৬ সালের ২০ মার্চ কুমিল্লার ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। এই ঘটনার ৪ বছর পেরিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত কোনো আসামি গ্রেফতার হয়নি। তদন্ত রিপোর্টও আলোর মুখ দেখেনি। ২০১৭ সালের মার্চে বনানীর রেইনট্রি হোটেলে আমিন জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে কর্তৃক ধর্ষণের বিচার হয়নি। শিল্পপতি লতিফুর রহমানের মেয়ে শাজনীন তাসনিম রহমান ধর্ষণ ও হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় পেতে লেগেছে ১৮ বছর। এথেকেই বোঝা যায় সাধারণ মানুষ কতটুকু বিচার পায়। কখনো সখনো নিম্ন আদালতে রায় হলেও উচ্চ আদালতে রায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। এমনিতেই নানান সামাজিক বিধি নিষেধ, হেনস্তার ভয়ে অনেক ঘটনা সামনে আসে না, মামলা পর্যন্ত হয় না। আবার যে মামলাগুলো হয় তার বিচার হয় না। ধর্ষণের মামলার মাত্র ৩ শতাংশের শাস্তি হয়, বাকি ৯৭ শতাংশেরই কোনো বিচার হয় না বা খালাস পেয়ে যায়। ফলে ধর্ষণের ঘটনার বিচারহীনতা ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে, ধর্ষণ-নির্যাতন বাড়ছে।

এই সময়ে মৃত্যুদণ্ডের দাবিকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে

ধর্ষকদের বিচার হোক এটা সবাই চান। এই সময়ে যখন সারা দেশে ধর্ষণ, নিপীড়ণ ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে এবং প্রায় সবগুলো ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকার কারণে ক্ষমতসীন আওয়ামী লীগ ও তাদের অঙ্গ সংগঠনসমূহ ব্যাপকভাবে ধিকৃত–তখন তারা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের ব্যানারে একদল লোক নামিয়ে এই দাবি প্রচারে আনছেন যে, ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ডের আইন করা উচিত। অর্থাৎ সরকার ব্যবস্থা ঠিকই নিচ্ছেন কিন্তু আইনের ফাঁক দিয়ে ধর্ষকরা বেরিয়ে যাচ্ছে, এই ফাঁক অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। এটা নিয়েই একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে চলতে থাকুক, সরকারের দিকে তাক করা আঙুল এই বিতর্কে ঢেকে যাক–তারা এটাই চাইছেন। এ ব্যাপারে তারা তৎপরও। ইতিমধ্যে তড়িঘড়ি করে মন্ত্রীসভায় সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বিচারহীনতার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে অনেক লোক এই দাবি সমর্থনও করছেন। বাস্তবে কী ঘটবে? প্রচলিত আইনে ধর্ষণ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়ার কথা। এ পর্যন্ত কতজন ধর্ষণকারীর ব্যাপারে এ রায় হয়েছে? কতগুলো কার্যকর হয়েছে? বিচার অবশ্যই হওয়া দরকার। বিচার করার জন্য সরকারকে বাধ্য করতে হবে। তাহলে অবশ্যই ধর্ষণ–নির্যাতনের মাত্রা কমবে। কিন্তু যেখানে বিচারই হয় না সেখানে ফাঁসির আইন পাশ করলেই কী সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? এ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে অনেক তর্ক হতে পারে। কিন্তু ফাঁসি না যাবজ্জীবন এটা কি আমাদের মূল সমস্যা কিংবা কোন বড় একটা সমস্যা? তা মোটেই নয়।

ফ্যাসিবাদী শাসন ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি ধর্ষকদের পৃষ্ঠপোষক

এই বিচারহীনতার কারণ কী? এই ঘটনাগুলোর প্রায় সবকটির সাথে জড়িত থাকে ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা–কর্মী ও তাদের দোসররা কিংবা বিত্তশালী লোকজন। সাম্প্রতিক কয়েকটি আলোচিত ঘটনার ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়। যেমন এমসি কলেজে গণধর্ষণ বা নোয়াখালীতে নারীকে বিবস্ত্র করে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় ছাত্রলীগ–যুবলীগ যুক্ত। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ভোট ডাকাতির মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন হয় সেই সময় এই নোয়াখালীতেই নৌকা মার্কায় ভোট না দেয়ায় চার সন্তানের জননী এক নারীকে গণধর্ষণ করেছিল আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা। ফলে দেখাই যাচ্ছে, ধর্ষণ–গণধর্ষণের সাথে ক্ষমতার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। পুলিশ স্টাফ কলেজের গবেষণার তথ্যানুযায়ী, ধর্ষকদের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে ১৪.৯ শতাংশ ধনিক শ্রেণীর সন্তান, ৯.১ শতাংশ রাজনীতিবিদদের সন্তান/আত্মীয় এবং ৪.৬ শতাংশ রাজনৈতিক নেতা–কর্মী। ফলে ধর্ষণ কেবল বিকৃত যৌন বাসনা নয়, ক্ষমতার প্রকাশ। এই ক্ষমতার মধ্যে রাজনৈতিক ও বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের আধিপত্যমূলক মনোভাব – দুটোই জড়িত।

ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা এই কাজ কেন করছে? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শুধু আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপি–জামাত সরকারের সময়েও এই ধর্ষণ, নিপীড়ণ, লাঞ্চনা, নির্যাতন চলেছে এবং তাদের কর্মীরা এই দায়িত্ব পালন করেছে। তাদের ক্ষমতা দখলের লড়াই, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের ভিত্তি হল এই কর্মীরা, ক্যাডাররা। এই দলগুলোকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনে দেশের বড় বড় পুঁজিপতি শিল্পপতিরা। দেশটা একটা স্বাধীন দেশ নামমাত্র, বাস্তবে কতগুলো গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের মধ্যে দেশটা ভাগ করা। দেশের সম্পদ লুট করে তারা টাকার পাহাড় গড়েছে। দু'হাত ভরে লুটপাটের এই রাজত্বে তাদের হয়ে যারা শাসনের ভার পায়, সেই রাজনৈতিক দলের কাজই হল বিক্ষোভ দমন করে দেশকে শান্ত রাখা। এই দমনের জন্যই দলীয় কর্মীদের ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা হয়, দলের চেতনা, আদর্শ এই কথাগুলো লোক ভুলানো গল্পমাত্র।

পুঁজিবাদ একদিন নারীদের স্বাধীনতার দাবি তুলেছিল, আজ সে নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে উপস্থাপন করছে

ফলে বিচারহীনতার প্রশ্ন সম্পর্কিত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে, আর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কিত তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে। সামন্ত অর্থনীতির যুগে নারীরা ছিল গৃহবন্দী। তাদের স্বাধীন

ইচ্ছার কোনো মর্যাদা ছিল না। ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা তাদের পদে পদে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল। রাজারাজন্যের সমাজব্যবস্থা ভেঙে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তনের কালে সাম্য–মৈত্রী–স্বাধীনতার স্লোগান উচ্চারিত হলো। নারীদের সম্পর্কে পুরনো অনেক ধ্যান–ধারণার পরিবর্তন ঘটতে লাগল। বিজ্ঞান ও যন্ত্রের ব্যাপক বিকাশের ফলে উৎপাদন অনেক বেড়ে গেল, অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দিল, নারীদের ঘর থেকে বের করতে হলো, ধর্মের বিধি–নিষেধ অনেক আলগা হয়ে গেল। নারী শ্রমিকরা লড়াই করে অর্জন করেছিল তাদের ভোটাধিকার, সমকাজে সম–মজুরির দাবি তুলেছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এই স্লোগানটাও আর জারি রাখতে পারল না। ক্রমে একচেটিয়া পুঁজির সৃষ্টি হলো, ব্যক্তিমালিকানা ও মুনাফা নিশ্চিত করতে গিয়ে সামাজিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে জন্ম দিল নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। এখন পুঁজিবাদের আদর্শ হয়েছে 'খাও দাও স্ফূর্তি কর।' নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপনে এমনকি সাহিত্যে সর্বত্র ভোগবাদের জয়গান। নারীকে নগ্ন, অর্ধনগ্ন হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের বইয়ে এটা এখন স্বীকৃত তত্ত্ব যে, পণ্য বিক্রির জন্য সবচেয়ে কার্যকরী ও অব্যর্থ মার্কেটিং পলিসি হলো যদি পণ্যের সাথে 'সেক্স অ্যাপিল' ভোক্তার সামনে রাখা যায়। তাই সাবান, তেল, শেভিং ক্রীম বা পারফিউম যাই হোক না কেন, সেটি বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপনে তার সাথে উপস্থাপিত হয় আরেকটি পণ্য–নারীদেহ। খেলার সৌন্দর্য্য আজ তাই আর যথেষ্ট নয়, দর্শক মাতাতে আমদানি করা হয়েছে স্বল্পবসনা চিয়ার্স গার্লদের।

নারীর প্রতি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই গড়ে উঠেনি

গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম করলেও আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার প্রসার সে অনুপাতে ঘটেনি। একদিকে ভোগবাদী সংস্কৃতি, অন্যদিকে ধর্মীয় কূপমন্ডুকতা–এ দুটোই এদেশের নারীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। জন্মের পর থেকে পদে পদে একজন মেয়েকে যেমন সবকিছু মানিয়ে চলতে শেখানো হয়, ঠিক তেমনি একজন পুরুষকেও প্রচণ্ড পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় গড়ে তোলা হয়। দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাতেও একজন মানুষকে কূপমণ্ডুক–পশ্চাৎপদ চিন্তা ও বৈষম্যের মানসিকতা থেকে বের করার আয়োজন নেই। তিন ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় (মাদ্রাসা, বাংলা, ইংরেজি) বৈষম্যকে স্থায়ী রূপ দেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা আর ইংরেজি মাধ্যমের একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে মানসিকতা–সংস্কৃতি–আর্থিক সামর্থ্যের বিশাল পার্থক্য তৈরি হয়ে আছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ছাত্রের কোনো সুযোগই থাকে না গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে নারীকে দেখার। বাচ্চাদের শেখানো হয়, পুরুষের প্রয়োজনেই নারীর সৃষ্টি, স্ত্রী হলো স্বামীর শস্যক্ষেত্র, স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেস্ত, নারীর কাজ ঘর সামলানো–সন্তান উৎপাদন করা, নারী–পুরুষের একসাথে মেলামেশা–চলাফেরা করা উচিৎ নয় তাতে ব্যভিচার জন্ম নিতে পারে, নারী নেতৃত্ব হারাম ইত্যাদি। মূলধারার শিক্ষাতেও আমরা অংক করতে করতে বড় হই–'একটি কাজ দুইজন পুরুষ করে চার দিনে, আর চারজন নারী করে চার দিনে। কাজেই একজন পুরুষ = দুইজন নারী।' মেয়েদেরকে অধিকাংশ স্কুলে পড়ানো হয় গার্হস্থ্য অর্থনীতি আর ছেলেদের কৃষিশিক্ষা। ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়, মেয়েদের কাজ কোনটা আর ছেলেদের কোনটা। পড়াশুনার ধরন এমনভাবে দাঁড় করানো হয়েছে যে, খেলাধুলাসহ নানা বিষয়ের উপর বইপড়া অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। খেলার মাঠ বেদখলে। গানের নামে চলছে উচ্চলয় আর যন্ত্রের শব্দের মাঝে প্রবেশ করানো অশ্লীল শব্দ ও হালকা কথাবার্তার পরিবেশনা। শিশু–কিশোররা এগুলোই শুনছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসানো আছে সাইবার ক্যাফে আর ভিডিও গেমসের দোকান। মোবাইলে পর্নোগ্রাফি এখন হাতের মুঠোয়। একদিকে চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিকতা, অন্যদিকে ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে বড় হয়ে উঠছে আমাদের ভাই- বোনেরা। মাদকদ্রব্য তো অলি–গলিতেই মেলে। খোদ ঢাকা শহরে দৈনিক ১২ কোটি টাকার ইয়াবার ব্যবসা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে নেশার আড্ডা বসে। জন্মদিন, ভাল ফলাফলে ট্রিট দেয়ার একটা অংশ হল মদের আড্ডা। ব্যক্তি স্বাধীনতার চিন্তাকে এমন ধাঁচায় গড়ে তোলা হচ্ছে, যেন সবার সম্মতিতে নোংরামি করলে সেটা আর নোংরা বিষয় থাকে না।

প্রকৃত আনন্দের রূপ কিশোর–তরুণরা জানে না, সেসবের চর্চাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হয় না। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর একমাত্র কার্যকারিতা হচ্ছে চাকুরি পাবার এবং এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য উপযুক্ত

লোক তৈরি করা। নীতি-আদর্শ এগুলো আজ সব কেতাবি বিষয়। ফলে নিজের স্বার্থসুবিধা, ভোগ আকাঙ্ক্ষাই যেখানে সর্বাগ্রে-সেখানে সুযোগ পেলে নারীকে নিপীড়ন করার মধ্যেও আনন্দ খুঁজে পাওয়া যাবে, সেটাই স্বাভাবিক। পুঁজিপতিরাও চাইছে- পণ্য বিক্রি করো, দরকার হলে প্রবৃত্তিকে উসকে দাও, অমানুষ করো, তাও পণ্য কেনাও। নারীর প্রতি বিকৃত রুচিহীন ভোগলিপ্সা এই আয়োজনগুলিরই ফলাফল। ফলে কোনো একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার বিচার ও শাস্তি যেমন আমরা চাইবো, তেমনি রাষ্ট্রীয় মদদে তরুণদের চরিত্র নষ্ট করার এ সর্বগ্রাসী আয়োজনের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে হবে।

পরিবার ও প্রথাগত নিয়ম-কানুনের মধ্যেও নারীর সমান অধিকার নেই

নারীকে সমমর্যাদায় দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় হয়ে উঠার শিক্ষা এমনকি আমরা পরিবার থেকেও পাইনা। কেননা পরিবারও দেশের প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়ে পরিচালিত হয়। দেশের প্রচলিত ব্যবস্থা যেহেতু শোষণমুলক, দুর্বলের উপর সবলের নিয়ন্ত্রণ – পরিবারেও তেমনি পুরুষের দ্বারা নারীরা নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্মীয় ও প্রচলিত নিয়ম-কানুনে সম্পদ ও সম্পত্তির মালিকানা প্রধানত পুরুষের হাতে থাকে, নারীদের তাতে অধিকার নেই। 'নারী পুরুষের অর্ধেক' এই নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় বলে পরিবারগুলোতে খুব ছোটকাল থেকেই একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে সুক্ষ্মভাবে বৈষম্যমুলক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়া করতে থাকে। নারীরা পুরুষের অধঃস্তন-এই বোধ পারিবারিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে কাজ করে। সুতরাং পরিবারেও নারীকে সমান মর্যাদা দেয়া কিংবা শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সাথে নারীকে গ্রহণ করার শিক্ষা আমাদের দেয়া হয় না। তাই পরিবারে নারীরা নানাভাবে শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। সভ্যতা পত্তনের পর থেকে মানুষের সমাজব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে সত্যি; কিন্তু শোষণমুলক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি, নারীর প্রতি সাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি আসেনি। যদিও সাম্যের কথা স্লোগানের অর্থে উচ্চারিত হয়েছে। ফলে সমাজের দুর্বল অংশ হিসেবে নারীরা সবসময়ই এই শোষণের শিকার হয়েছে।

ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রভাব নারীদের মধ্যেও পড়ছে

প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি মেয়েদের মানবিক গুণাবলীর পরিবর্তে দৈহিক সৌন্দর্য্যের যে দিকটিকে তুলে ধরতে চায়, বুঝে হোক না বুঝে হোক মেয়েরাও এর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। মানুষ হিসেবে মনুষ্যত্বের সাধনাই তার কর্তব্য, সকল সংস্কার ও সামাজিক অবিচার বৈষম্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোতেই তার মর্যাদার আসন – পরিবার ও চারপাশের পরিবেশ থেকে এ শিক্ষা তাকে দেয়া হয় না। উল্টো বিজ্ঞাপন, সিনেমা, নাটকে প্রতিমুহূর্তেই শেখানো হচ্ছে- কিভাবে সিল্কি চুলে, রঙ্গিন সাজ পোশাকে, ত্বক ফর্সা করার প্রচেষ্টার মধ্যেই স্মার্ট হওয়ার রহস্য লুকিয়ে আছে। শিক্ষিত মেয়েরাও এই সংস্কৃতির শিকার। জীবনাদর্শে, মহত্ত্বে, মানবিক সৌন্দর্য্যে মডেল বা আদর্শ হবার উৎসাহ তাদের দেয়া হয় না বরং দেহের সৌন্দর্য্যে তাক লাগিয়ে ক্রেতাকে পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করার জন্যই তাকে প্রস্তুত করা হয়। নতুবা তাকে শেখানো হয় তুমি ঘরে থাকো, সংসার দেখো, স্বামীকে সেবা করো ও তাকে খুশি করো- এর বাইরে তোমার ভাবার দরকার নেই। বেগম রোকেয়া এর বিরুদ্ধে তাঁর কলম ধরেছিলেন। তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত লোকেদেরও তাঁদের স্ত্রীর ব্যাপারে এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখে তিনি নারীদেরকে এ থেকে বেরিয়ে আসতে আহবান জানিয়েছিলেন।

ধর্মের নামে মৌলবাদীরা মেয়েদের ঘরে বন্দী রাখতে চায়

নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলোকে অনেকে ব্যাখ্যা করেন ভিন্নভাবে। তারা বলেন, নারীরা শালীন পোশাক পড়লে, পর্দা করলে এ পরিস্থিতি তৈরি হত না। অনেক ধর্মীয় নেতাদের বক্তব্য খুবই উগ্র। যারা এমন যুক্তি করেন তারা কেউই নির্যাতকদের বা অপরাধীদের শাস্তির কথা বলেন না। মনোভাব এমন যে, নারীরা ঘরের বাইরে বেরিয়েছে, তাই লাঞ্ছিত হলে দোষ তো তাদেরই। পুরুষের আবার দোষ কি? এ মতানুযায়ী, ২৩ মাসের শিশু ধর্ষণের কারণও শিশুটি নিজে! বছর দু'য়েক আগে মোহাম্মদপুরের প্রিপারেটরি বালিকা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রথম ও পঞ্চম শ্রেণীর দুই শিশুকে যৌন নির্যাতন করে স্কুলের কয়েকজন কর্মচারী। ধর্মব্যবসায়ীরা কী বলবেন এটাকে? অবুঝ ওই শিশুগুলো পর্দা করেনি বলে তাদের এই পরিণতি? প্রবৃত্তির

উপর মানুষ যৌক্তিক-নৈতিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলেই অন্য প্রাণী থেকে সে আলাদা। মানুষের সমাজে যৌন সম্পর্ক ছাড়াও নারী-পুরুষের নানা-বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবিক সম্পর্ক থাকে। স্নেহ-ভালোবাসা-শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে এই সম্পর্কগুলোর কথা যারা ভাবতে পারে না, কেবল যৌনতাকেই প্রধান মনে করে, তাদের রুচি-সংস্কৃতিবোধ আদিম এবং স্থূল। তাই বলা যায়, নারী নির্যাতনের কারণ কখনই পর্দা বা পোষাক নয়, এর কারণ পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। নারীকে দেখলে যার উন্মাদনা তৈরি হয় সেটা তার মানসিক বিকৃতি। সেক্ষেত্রে সে কতটুকু স্বাভাবিকভাবে সমাজে চলবে, তা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। বহু বছর আগে বেগম রেকেয়া এ প্রশ্নটি তুলেছিলেন যে, কোনো পশু যদি লোকালয়ে তাণ্ডব করে তাহলে করণীয় কি? মানুষদের বলা হবে ঘরে বন্দী থাকতে নাকি পশুকে খাঁচায় বন্দী করা হবে? নারী-পুরুষের সহাবস্থান, নারীকে কর্মক্ষেত্রে অধিকার দেয়া-সমাজের বিকাশের জন্যই প্রয়োজন। যারা নারীকে উল্টো অবরুদ্ধ করার কথা বলেন, প্রকৃতপক্ষে তারা সমস্যার সমাধান না করে সভ্যতার চাকাকে পিছনে ঘোরাতে চান। যা কখনই কাম্য হতে পারে না।

ইতিহাস বলে নারী চিরকাল অবরুদ্ধ ছিল না

ছোটবেলা থেকেই আমরা শিখি যে, নারী ও পুরুষ সমান নয়। একথা সত্য যে, বর্তমানে বড় অংশের নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে। কিন্তু যে সত্য প্রতিমুহূর্তে আড়াল করা হয় তা হলো, মানব সভ্যতার শুরুতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্যই ছিল না। সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণায় এটা আজ প্রমাণিত সত্য। গুহা মানব-মানবীর প্রায় কাছাকাছি শারীরিক কাঠামো কিংবা শিকারে নর-নারীর সহাবস্থানের ছবি সেই প্রমাণই দেয়। নারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতার কারণে নারীদেরই বরং সেই সময় এগিয়ে রাখা হত। আদিম সমাজে কৃষি, পশু পালন, পোষাক বুনন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নারীদেরই ছিল অগ্রগণ্য ভূমিকা। মহান দার্শনিক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস দেখান যে, শুরুতে মানবসমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। কিন্তু সমাজে যখন স্থায়ী সম্পত্তি ও তার মালিকানা তৈরি হলো তখনই মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল। সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানা আসার পর পরিবার ও সম্পদের কর্তৃত্ব চলে গেল পুরুষের হাতে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রয়োজনে বংশধারা নিশ্চিত করতেই 'সতীত্ব' রক্ষার নামে নারীকে গৃহবন্দি করা হলো। পরবর্তীতে ধর্মীয় ও নানা সামাজিক বিধি-নিষেধের রূপে নারীদের উপর নানা নিয়মের শৃঙ্খল আরোপিত হয়েছিল। হাজার হাজার বছরের পিছিয়ে পড়া অবস্থান নারীদের শারীরিক-মানসিক দিক থেকে সীমাবদ্ধতা তৈরি করেছে। নারীদের আজ শারীরিকভাবে খর্বাকৃতির বা দুর্বল ভাবা হয়। প্রাণীজগতের অন্যান্য অংশের মধ্যে লিঙ্গভেদে এতটা পার্থক্য হয় না, যতটা মানুষের সমাজে হয়েছে। জীববিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে, বহুবছর ধরে নারীদের অবরুদ্ধ করে রাখাই নর-নারীর শক্তির পার্থক্যের কারণ। তবে সমাজের সকল বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, গণিতসহ সকল ক্ষেত্রে নারীদের এখন অগ্রণী অবস্থান তৈরি হয়েছে। এভারেস্ট জয় করেছে নারী। নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আজ একথা বলার আর উপায় নেই যে, নারীদের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত ছোট হবার কারণে পুরুষের তুলনায় তাদের বুদ্ধি কম। এটা বিজ্ঞানে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, সমাজে বৈষম্য যত কমবে, নারী-পুরুষের এই পার্থক্যও তত কমতে থাকবে।

এভাবেই কি চলতে থাকবে?

বহু বছর আগে নারীজাতির দুর্দশা দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সৎ অসৎ বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকতা রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।' সামন্ত সমাজে যে কষ্ট নিয়ে বিদ্যাসাগর একথাগুলো বলেছিলেন আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে তার তীব্রতা কতটুকু কমেছে? আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা বলে, ঘরে-বাইরে কোথাও নারী নিরাপদ নয়। সামাজিক বৈষম্য যত বৃদ্ধি পেয়েছে, নারীর প্রতি নির্যাতন-নিপীড়ন তত বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্ষণ তো ছিলই, এখন গণধর্ষণের মতো ঘটনার সংখ্যা আমাদের আতঙ্কিত করছে। ঘটনার পর যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের মধ্যে কোনরকম ভয়-অনুতাপ কিছুই লক্ষ করা যায় না। এসবের ভিডিও করে ফেসবুকে আপলোড

করছে তারা। এ যেন বন্ধুবান্ধব মিলে মজা করার মতো ব্যাপার।

এরা কারা? এই প্রজাতি পৃথিবীতে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? তিন বছরের শিশু কন্যা থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধা নারী– যে কাউকে ধর্ষণে তাদের বিবেক এতটুকু কেঁপে ওঠে না কেন? এরা কি জন্ম থেকেই ধর্ষক? এদের জন্মদাতা কে?

এদের জন্ম দিয়েছে এই সমাজ, এই রাষ্ট্র। এটা সেই রাষ্ট্র যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক দিনের পর দিন উপবাসে থাকে। দেশে ৪ কোটি বেকার। এই বেকার যুবকরা নৌকা নিয়ে উন্মত্ত সাগর পাড়ি দেয় কাজের সন্ধানে। মাঝসমুদ্রে নৌকা ডুবে মারা যায়, ঘরের ছেলেদের সারি বাঁধা কবর খুঁজে পাওয়া যায় থাইল্যান্ডের জঙ্গলে। কলমের এক খোঁচায় পাটকলের হাজার হাজার শ্রমিক রাস্তায় বসে যায়, তারা জানে না কোথায় যাবে, এমনকি ন্যায্য বকেয়া পর্যন্ত তারা পায় না। দিবারাত্রি অমানুষিক খেটে বেঁচে থাকার মজুরি জোগাড় করতে পারছে না গার্মেন্টস শ্রমিকরা, মরছে ফ্যাক্টরির মধ্যে আটক অবস্থায় আগুনে পুড়ে কিংবা বাতিল হয়ে যাওয়া ভবনের তলায় চাপা পড়ে। দুর্ঘটনা নিশ্চিত জেনেও তাদের কাজে যেতে হয়, কারণ কাজ না করলে না খেয়ে মরতে হবে। হাহাকার চারিদিকে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। টঙ্গীর গার্মেন্টস শ্রমিক থেকে গাইবান্ধার গ্রামের কৃষক–কে নেই এই কাতারে? দাম না পেয়ে সবজি রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে কৃষক, দুধ ড্রেনে ফেলে দিচ্ছে খামারি। দুধের শিশুকে বিক্রি করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরছে দরিদ্র মা। শহরের রাস্তায়, রেল স্টেশনে, ফুটপাতে হাজার হাজার পরিবার। শিশু জন্ম নিচ্ছে ও বেড়ে উঠছে রাস্তায়। এরা জানে না মায়ের স্নেহ কী, বাবার আদর কী। ভালবেসে এদেরকে কেউ কাছে টানেনি, আদর করে মান ভাঙায়নি। অভিমান করার কোনো অধিকারই সমাজ তাদের দেয়নি। তারা মায়ের কাছে খেলনার বায়না করে কাঁদে না, ভাত চেয়ে কাঁদে।

এটা বাংলাদেশের একটা চিত্র। একদিকে এই অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, গৃহহীন, বস্ত্রহীন বাংলাদেশ; আর একদিকে বিরাট জৌলুসের বাংলাদেশ। যেখানে কোটিপতির সংখ্যা বৃদ্ধির হারে সে গোটা পৃথিবীতে প্রথম। পাঁচতারা হোটেলে দেশি–বিদেশি ব্যবসায়ীদের সম্মিলনে হাজার হাজার কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট হয়, অথচ না খেয়ে খাটা শ্রমিক ন্যায্য মজুরি পায় না। কন্ট্রাক্ট সাইন শেষে ডিনার করে মালিকরা বাড়ি যান, ডিনারের প্রতি প্লেটের মূল্য শ্রমিকের মাসের বেতনকে ছাড়িয়ে যায়। আর ভোটের আগে এই গরিব মানুষের কষ্ট নিয়ে দেশবরেণ্য নেতারা বক্তব্য রাখেন, অশ্রু বিসর্জন করেন। গরিবের কষ্টও একটা ক্যাপিটাল, এই পুঁজি খাটিয়ে লাভ তুলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় জননেতারা।

’৭১ সালে শোষণ–বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন নিয়ে জন্ম নিয়েছিল এই দেশ। স্বাধীনতা–পরবর্তীকালে পুঁজিপতিশ্রেণি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। প্রথমে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রাষ্ট্রের টাকায় কলকারখানাগুলোকে দাঁড় করিয়ে, তারপর বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একে একে তুলে দেওয়া হয় ব্যক্তিমালিকানায়। গোটা ’৮০–র দশকে উদারনৈতিক অর্থনীতির জয়গান গেয়ে ও ব্যাংকসহ রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যাপক লুটপাট করে গড়ে ওঠে একটি পুঁজিপতি–শিল্পপতি শ্রেণি। সময় গিয়েছে, ধনবৈষম্য ব্যাপকভাবে বেড়েছে। যে–ই ক্ষমতায় এসেছে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ দেদার লুটপাটের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা শক্তিশালী হয়েছে। তাদের সম্পদ বেড়ে আকাশ ছুঁয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক বিগ হাউজদের জন্ম হয়েছে। তারাই আজ সবকিছুর নিয়ন্তা। ৫ বছর পরপর ক্ষমতায় আসা রাজনীতিবিদরা ম্যানেজার মাত্র। দেশের পার্লামেন্টের ৬১ শতাংশ ব্যবসায়ী। দেশ পরিচালিত হয় বিগ বিজনেস হাউজের ইশারায়।

এই গোষ্ঠীর কাছে মুনাফা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা নেই, মূল্যবোধ বলে কোনো শব্দ তাদের অভিধানে নেই। মুনাফার জন্য তারা করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। দুই হাতে তারা জনগণের টাকা লুট করছে। এদের রাজত্বে নারী লাঞ্ছনা, শিশু নির্যাতন, প্রতিবাদীদের হত্যা নিত্যদিনের ঘটনা। ন্যায়নীতিসম্পন্ন, মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ এখানে অবাঞ্ছিত, অসহায়।

এই মানুষেরা কার উপর নির্ভর করবেন? কোথায় বিচার চাইবেন? পরপর কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনায় সারাদেশ যখন ঘৃণায়, ক্ষোভে, ব্যথায় মুহ্যমান তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য–ধর্ষণ সকল দেশেই ঘটে। এর

আগে পয়লা বৈশাখে টিএসসিতে নারী লাঞ্ছনার ঘটনায় পুলিশ কমিশনার মন্তব্য করেছিলেন, এগুলো কতগুলো দুষ্ট ছেলের কাজ। দেশের বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা মন্তব্য করেন–নারীরা তেঁতুলের মতো, দেখলে জিভে জল আসে।

এই তো রাষ্ট্রনেতা, প্রশাসনের কর্তাদের চরিত্র, ধর্মীয় গুরুর মন্তব্য। সংসদে নারীদের নিয়ে স্থূল হাস্যরস হয়, সাংসদরা আমোদে মাতেন, একে অপরের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপেন। তাহলে কোথায় নিরাপদ মেয়েরা? কোথায় মর্যাদা আছে? কোথাও নেই। কোনো জায়গাকে নিষ্কলুষ, সুন্দর, নির্মল রাখা যাবে না। রাখলে সেখান থেকেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠবে। তাই এই লুট, এই শোষণ জারি রাখতে হলে মূল্যবোধ, মানবিকতা ও সমস্ত সুকুমার বৃত্তিকে পিষে মারতে হবে। তারই আয়োজন চলছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, তারই ফলাফল এই ছাত্রলীগ, এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এই পুলিশ প্রধান, এই ধর্মীয় নেতা।

এইভাবে ৪৯ বছর ধরে তারা দেশ পরিচালনা করছেন। এটাই তাদের শাসনপ্রক্রিয়া। তারা জানেন–মানুষকে পশুর স্তরে না নামালে তাকে দিয়ে পশুর কাজ করানো যাবে না। সেই পশু সৃষ্টির সমগ্র আয়োজন তাই তারা করেন। এর উপর দাঁড়িয়ে চলে লুট, সম্পদ বৃদ্ধি, ব্যবসা। তাই, সারাদেশে মাদকের বিস্তার, পর্নোগ্রাফির প্রসার। আমেরিকায় ৬০–৭০ দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বিরোধী আন্দোলন থেকে যুবসমাজকে সরাতে সিআইএ–র পরিকল্পনায় ড্রাগস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফিলিস্তিনিদের টিকে থাকার আন্দোলন দমাতে ইসরাইলী সরকারের একটি কৌশল হলো–ইসরাইলী যুবকদের টার্গেট করে অসংখ্য পর্নো টিভি চ্যানেলের অবিরত সম্প্রচার, যাতে তাদের লড়াকু ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মন নষ্ট হয়ে গিয়ে তারা পরিণত হয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ভোগলিপ্সু ও বিকৃত রুচির পশুতে।

আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট যে, বিনা ভোটে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ফ্যাসিবাদী শাসন টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সরকার এদের লালন করছে। ধর্ষণসহ সমস্ত অপরাধ করার লাইসেন্স দিয়েছে। অন্যদিকে মাদক, পর্ণোগ্রাফির বিস্তার ঘটিয়ে এমন একদল মানুষ তৈরি করছে যাদের মধ্যে ন্যূনতম মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব নেই। যাদের শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষার প্রয়োজনে, শোষিত–নিপীড়িত মানুষের বিক্ষোভ–আন্দোলন দমনের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি মজুদ বাহিনী হিসেবে কাজে লাগানো হয়। জনগণের বিভিন্ন আন্দোলম দমনে এদেরই হেলমেট–হাতুড়ি বাহিনীর ভূমিকায় দেখা যায়।

তাই এই পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধানের জন্য, নারীর সত্যিকারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এই শোষণমূলক সমাজকে উচ্ছেদ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। মানব ইতিহাসে এই ঘটনা ঘটেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এবং মানবসভ্যতা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল এর রূপ কেমন হতে পারে। নারীধর্ষণ, সামাজিক অপরাধের হার শূন্যের কাছাকাছি নেমে এসেছিল। দেহ বিক্রি করে যারা পেট চালাতো, সেই নারীদের পুনর্বাসন করা হয়েছেল, ভেঙে দেওয়া হয়েছিল নারীব্যবসায়ী চক্র। নারীরা শিক্ষায়, কর্মক্ষেত্রে, জ্ঞান–বিজ্ঞান চর্চায়, খেলাধুলায় এমনকি দেশরক্ষায় অগ্রসর ও পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। চীনে হাজার বছরের সামন্ততান্ত্রিক নিগড়ে নিষ্পেষিত নারীসমাজকে মুক্তি এনে দিয়েছিল বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ।

তাই সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান নেই। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত কি আমরা নীরবে সবকিছু মেনে নেব? একজন নারী একজন স্বাধীন মানুষ, তার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী চলবার অধিকার আছে। ফলে আজ যদি আমরা নিষ্ক্রিয় থাকি, শত–সহস্র লাঞ্ছিতার আর্তচিৎকার যদি আমাদের বিবেকে এসে না বাজে মানুষ হিসেবে আমাদের পরিচয়ই বা থাকে কি? সমস্ত বড় মানুষেরা মানুষের দুঃখ–যন্ত্রণাকে অন্তরে ধারণ করে বড় হয়েছেন, স্বেচ্ছায় সামাজিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

তাই আজ আমাদের এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। কোন মানুষই ধর্ষক হয়ে জন্মায় না। এই বৈষম্যের সমাজ তাকে ধর্ষকে রূপান্তরিত করে, তার টিকে থাকার স্বার্থেই করে। ফলে এই বেদনা, এই কষ্ট, এই ক্ষোভের জলোচ্ছ্বাসকে সমাজ ভাঙার জন্য কূল ছাপিয়ে আছড়ে পড়তে হবে, নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হতে হবে। না হলে বারবার একই চিত্র আমাদের অশ্রুভেজা চোখেই প্রত্যক্ষ করতে হবে।

মূল্য: ৫ টাকা

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড শিশু কল্যাণ ভবনের (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ: ৯৫৭৬৩৭৩। মোবাইল: ০১৭১২৯৮১৪২২, ০১৬৮০১৭৯৭৯৪।
ওয়েবসাইট: www.spbm.org / মেইল: studentfront1984@gmail.com / ফেসবুক: @Anushilonssf